Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী আবদুল ওদুদ : মনন-উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোস্তাক আহমাদ দীন
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.9
Pages	১৭৭-১৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কাজী আবদুল ওদুদ : মনন-উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত

Check for updates

মোস্তাক আহমাদ দীন*

কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) *বাংলার জাগরণ* (১৯৫৬) বইটি পড়ে মনে হবে তাঁর মননের প্রধান উৎস বাংলার রেনেসাঁস—এ-বিষয়ে ওদুদের লেখার অভিমুখ এমন সিদ্ধান্তের পক্ষেই যায়, কিন্তু ওদুদের সৃজনবৈচিত্র্য ও বহুমুখী চিন্তার বিস্তার তাঁকে যে-স্তরে নিয়ে যায় সেখানে তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন বহুদ্বন্দ্ব-পীড়িত বাঙালি মুসলিমমননের এক ব্যাখ্যাপেক্ষী চরিত্র, যেখানে তাঁর চিন্তায় বহু মাত্রাই শুধু নয়, বহু জটেরও অন্বয় ঘটেছে। তারপরও ওদুদের নানা ইঙ্গিতব্যঞ্জক মন্তব্য পড়ে মনে হয়, তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল বাংলার রেনেসাঁস, আর যারা রেনেসাঁসের ভাবপুরুষ তাঁদের বহুবিধ কর্মকাণ্ডই তাঁর অস্ফুট-অর্ধস্ফুট অনেক চিন্তা প্রকাশের পথ করে দিয়েছিল।

ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ (১৯২৮) এবং *বাংলার জাগরণ* নামক গ্রন্থ—উভয় লেখারই প্রধানতম কেন্দ্র হলেন রাজা রামমোহন রায়। বইটিতে যে-সব বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে, তা হলো :

> ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, তুহফাতের পরিচয়, সতীদাহের নৃশংসতার বর্ণনা, ব্রাহ্মধর্মে বিধৃত বিবিধ চিন্তার আহরণ এবং এক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব, ডিরোজিয়ো প্রসঙ্গ, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা এবং হিন্দুনেতাদের কিছু বিস্তারিত বিবরণ, হিন্দু সমাজের পাশাপাশি বাংলার মুসলিম সমাজের কিছু পরিচয়। (ওদুদ, ১৯৯০ : ৫)

এখানে যে-সব ব্যক্তি এবং তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তাঁদের প্রতি ওদুদের আগ্রহের বিশেষ পরিচয় হলো তাঁর আলোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি আর ইশারাময় তির্যক মন্তব্য। এতে বাংলার রেনেসাঁসের প্রেরণাঋদ্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশাপাশি কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, এস এম লুৎফর রহমান এবং কাজী নজরুল ইসলামেরও সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ওদুদ তাঁর মননচিন্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন*-এর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন নজরুলের কথা, কারণ, তাঁর মধ্যে স্থৈর্যের দৈন্য ও কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যে-বিশেষ গুণটি লক্ষ করেছিলেন তা হলো তাঁর বীর্যবত্তার ঝলক। নজরুলের এই বিশেষ গুণটির প্রতি ব্যক্তিওদুদের অনুরাগ কতটা, তা জানা না গেলেও, বাঙালি মুসলমানের জাগরণকালের একটি বিশেষ সময়কে বিচারের প্রয়োজনে সেই গুণের অধিকারীর উল্লেখটা ছিল খুব প্রাসঙ্গিক। ওদুদ লিখেছিলেন :

> নজরুলের অভ্যুদয়ের পর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "মুসলিম সাহিত্য সমাজ", মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা', আর

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিলেট কমার্স কলেজ, সিলেট।

> তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' Emancipation of the intellect. এই মন্ত্র তারা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোমা রোলাঁর কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে, আর হজরত মোহম্মদের কাছ থেকে। (ওদুদ, ১৯৯৫ : ১৩৮-১৩৯)

বাংলার জাগরণ বইয়ের দীর্ঘ আলোচনার শেষদিকে এসে ওদুদের এই মন্তব্য দুই শতাব্দীর পারম্পর্যের দিকটির কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, তেমনই মনে করিয়ে দেয় উনিশশতকের রেনেসাঁসপন্থীদের সঙ্গে আরেকটি বিশেষ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর চেতনাগত সেতুসূত্রের কথাও। এমনিতে বিশশতকের 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'কে বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁস বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত নন অনেকেই—তাঁদের মতে, উনিশশতকের রেনেসাঁস মুসলমান-সমাজে প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিল। (হায়াৎ, ২০০৮ : ২১২-১৩) তবে এ-প্রভাব ব্যাপক-অব্যাপক যাই হোক, বিশশতকের আন্দোলনটির বাতাবরণ-সৃষ্টিতে উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ভূমিকার কথা স্বীকার না করলে চিন্তার অনুক্রমিক ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। বুদ্ধির মুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে সৃষ্ট শেষোক্ত আন্দোলনটির সঙ্গে ওদুদ শুধু যুক্তই ছিলেন না, এর ভাবযোগীও ছিলেন এবং তার মুখবাণী 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—এই বাক্যটির ভাবটিও ওদুদের ছিল বলে অনুমান করেছেন সহযাত্রী আবুল ফজল (সাঈদ, ২০০১)। অথচ যে-সব কারণে রেনেসাঁসকে শুধু হিন্দুর রেনেসাঁস বলে অভিহিত করা যায়—যেমন রামমোহন এবং তাঁর অনুগামী কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ভাবান্দোলনের প্রসঙ্গ, তার সহৃদয় বয়ান পেতে হলে এখন পর্যন্ত ওদুদের বইটিরই শরণ নিতে হয়। তারপরও উল্লেখ করা জরুরি যে, ওদুদ তাঁর আলোচনায় উনিশ শতকের রেনেসাঁস যে হিন্দু সমাজেরই রেনেসাঁস এই মতের প্রতি পক্ষপাত দেখাননি, বরং তা উপেক্ষা করে দেখিয়েছেন, কিছু বাঙালি মুসলমান কীভাবে রেনেসাঁস-ভাবপুষ্ট কোনো-কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে প্রেরণা নিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যেই আছে, বুদ্ধির মুক্তিকামীরা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং হজরত মুহাম্মদ, রোমা রোলাঁ ও কবি সাদীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছেন; প্রথম দু-জনের প্রতি ওদুদের আগ্রহ ও অশেষ ঋণের কথা সুবিদিত, কিন্তু তাঁর মনন-উৎস খুঁজতে গেলে এ-ছাড়াও আরো কিছু ব্যক্তির উল্লেখ করা জরুরি—কারণ :

> কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যানধ্যারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল। (সাঈদ, ২০০১ : ১০২)

ওদুদ-সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই মতটি কোনো দূরকাল্পিকের দায়-সারা মন্তব্যমাত্র নয়। তিনি ছিলেন ওদুদের বন্ধু ও মননচর্চার সমব্যথী যাত্রিক, তাই তাঁর পক্ষে ওদুদের মননচিন্তার এমন মূল্যায়ন সম্ভব। তাঁর বিচার ব্যক্তিওদুদ এবং তাঁর অব্যাহত লেখা ও মননচর্চার ওপর নির্ভর করে যে রচিত হবে, তা না বললেও চলে। ওদুদের মনন-উৎস অনুসন্ধানের জন্যে আমরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। ওদুদ তাঁর আত্মকথায় লেখেন :

> ধর্মকে ভালবাসতে হবে কিন্তু গোঁড়ামি অচল—এই ধারণায় আমি উপনীত হই প্রবেশিকা পাশের পূর্বেই। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ পড়ি নি।... আমি যখন বি এ পড়ি তখন আমার বিবাহ হয়। আমার স্ত্রীর অপূর্ব স্নেহময় প্রকৃতি ও নিঃশেষ আত্মদানের ক্ষমতা থেকে আমার নতুন দীক্ষা হয় প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে। স্কুলে পড়েছি প্রধানত ঢাকা জিলায়, আমার মামার সঙ্গে থাকতাম। তিনি ঢাকায় চাকুরী করতেন। দশ বারো বৎসর বয়সে স্বদেশী আন্দোলন দেখি, ভালো ছেলে ছিলাম বলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সমাদর পেয়েছি। ভাল হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে সেই সময় থেকেই স্বাদেশিকতা, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার তারতম্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ ও চিন্তা করতাম। কলেজ জীবন কাটে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সিতে। সেখানে সহপাঠী ছিলেন—সুভাষচন্দ্র, প্রমথনাথ সরকার, নীরেন রায়, ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন ব্যানার্জি—এরা সবাই বিখ্যাত অধ্যাপক (সুভাষচন্দ্রের পরিচয় অবশ্য আজ নিষ্প্রয়োজন)। আমার মাতুল ছিলেন ধর্মভীরু, কিন্তু বিলাসীও। তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু আমার বয়স যখন পনের-ষোল তখন থেকেই আমার ধারণা হয় ওঁদের চিন্তায় আমার চলবে না। আমার পিতা ও কাকা গোঁড়া ছিলেন না আদৌ, বরং গোঁড়ামিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ধরন আমাদের পূর্বপুরুষদের কারও কারও ছিল। (ওদুদ, ১৯৯০ : ৩৩৫-৩৩৭)

ওদুদের মননশীল রচনায় পৌঁছাবার আগে তাঁর আত্মকথার এই অংশ—বিশেষত কিশোরবেলায় ধর্ম-বিষয়ে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত-হওয়ার বিষয়টি আমাদের বুঝিয়ে দেয়—সাহিত্য ও চিন্তাজগতে প্রবেশ করবার আগেই তাঁর মন একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে উঠছিল, ফলে এ-কথা ভাবাই যায়—তিনি যদি সাহিত্যচর্চা করেন, তাতে সুচিন্তার পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার একটি বিশেষ লক্ষ্যমুখও থাকবে। তিনি লিখেছিলেন "সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যার সমাধানের প্রয়াস"; (ওদুদ, ১৯৮৮ : ২৬৭) *নদীবক্ষে* (১৯১৯) উপন্যাসে মুসলমান চাষিদের জীবনের ঘটনাগুলোর বর্ণনায় দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বইটি পড়ে সেটিকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন :

> আপনার লিখিত 'নদীবক্ষে' উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষীগৃহস্থের যে সরলজীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি—এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৯ : ২২১)

এই চিঠি শুধু প্রেরণাজ্ঞাপক ছিল না, তাতে ওদুদের বিষয়গত 'নূতনত্বে'র কথাও অভিব্যক্ত। সৃজনশীল ধারায় কল্যাণপিপাসু মন নিয়ে সাহিত্যসাধনার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ওদুদ; রোমা রোলাঁর *জাঁ ক্রিস্তফ*-এর আঙ্গিকে *আজাদ* নামক একটি বড়মাপের উপন্যাসও শুরু করেছিলেন, তাঁর গল্পগ্রন্থ *মীর পরিবার*ও (১৯১৮) কম আদৃত হয়নি—এসবের পরও তাঁর পক্ষে সৃজনমুখী সাহিত্য রচনায় আজীবন মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ তৎকালীন মুসলিম সমাজের সংস্কারবদ্ধতা এবং এই কারণেই তাঁকে সরাসরি মননচর্চার দিকে যেতে বাধ্য করে, একসময় তা-ই হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠার মূল পরিচয়চিহ্ন। তাঁর একটি লেখা নিয়ে মাওলানা আকরাম খাঁ যখন অযৌক্তিকভাবে বাদমুখর হয়ে ওঠেন তখন ওদুদ তাঁর জবাবি-চিঠিতে যা লেখেন তাতে তাঁর বাঁক-পরিবর্তনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> সমাজের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মুসলমানের মুক্তির জগতে তাদের সার্থক হবার এক ছবির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, অথবা হতে চাচ্ছিল। কতকটা নির্জনে নীরবে আমাদের সেই সাধনা চলেছিল ও প্রধানত সাহিত্যকে অবলম্বন করেই আমাদের চিন্তাভাবনা বিচার-বিতণ্ডা অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু আপনারা আমাদের টেনে হাটের ভেতরে নিয়ে এলেন। এনে ভালো করলেন কি মন্দ করলেন তার বিচার কালের দরবারে হবে। (ওদুদ, ১৯৯৯ : ৮)

বোঝা যায়, এভাবে টেনে না আনলে তাঁর বুদ্ধির মুক্তির চেতনা প্রধানত কিছুটা পরোক্ষ এবং সাহিত্য-অবলম্বিতই থাকত, কিন্তু নির্জনতা ছেড়ে জনতার-ভিড়ে-চলে-আসার পরিপ্রেক্ষিতের জন্যে তিনি যে-বিশেষ ভাব-এ তাড়িত হলেন, তা-ই হয়ে গেল তাঁর জীবনের প্রধানতম কেন্দ্র, তাঁর বুদ্ধির মুক্তির চেতনাধারক লেখাগুলো যে সাধারণত মুসলিম সমাজকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে তার কারণও সেটি। তিনি দেখেছিলেন হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজ এখনো অধিক পরিমাণে সংস্কারগ্রস্ত ও নিদ্রিত, ফলে এদের জাগরণ-কামনার পেছনে প্রয়োজন আর অগ্রাধিকারগত কারণই কাজ করেছে বেশি।

তাঁর এরকম চিন্তা প্রকাশের জন্যে তিনি বুদ্ধির মুক্তিপন্থীদের মন্ত্রদাতাগণ ছাড়াও আরো যে-সব ব্যক্তিমানুষ ও তাঁদের চিন্তাকে তাঁর নিজের চর্চার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই তাঁর মননচর্চার নজির বিভিন্ন লেখায়। এক্ষেত্রে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, রোমা রোলাঁ, মুস্তফা কামাল, সাদীর সঙ্গে একই কাতারে কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানির নামও উল্লেখ করতে হয়—এঁদের সকলের কাছ থেকেই ওদুদ একই জিনিস যে চাইবেন না তাঁর পাঠকমাত্রই তা স্বীকার করবেন। জাত্যানুরাগ, মানবপ্রেম ও উচ্চাশার জন্যে তাঁর মন বহু ব্যক্তিত্বের প্রতি ধাবিত হয়েছিল—তাঁর এই বিশেষ প্রবণতা দেখে বীরত্ব-প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তাঁকে পৌত্তলিক হিসেবে অভিহিত করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সিরাজুল, ২০০২ : ৩৫৩); অন্নদাশঙ্কর রায় (কাদির, ১৯৭৬) তাঁর মূল্যায়নেও সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন কিছুটা। তারপরও ওদুদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নঞর্থক দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ কম—আসলে মহৎজনদের প্রতি তাঁর প্রেম, কখনো-কখনো ভক্তিপ্রদর্শন এবং তাঁদের চিন্তাকে তাঁদের সময়পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার চেষ্টাকে কারো কারো কাছে বীরত্ব-পূজা বলে মনে হয়েছে। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা থেকে ওদুদ কতটা গ্রহণ ও বর্জন করেছিলেন সে-আলোচনা করলে এ-কথার সত্য-মিথ্যা পাওয়া যাবে।

প্রবেশিকা পাশের আগেই ধর্মের গোঁড়ামি বর্জন করে তার মর্ম-অনুসারী হওয়ার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওদুদ, এর মধ্যে পরবর্তীকালে তাঁর রামমোহন-ভক্তির কারণ লুকোনো রয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে যে-জীবনদর্শন নিয়ে ওদুদের চিন্তাজগৎ তৈরি হচ্ছিল তাতে রামমোহনের ভাবনার মধ্যেই তাঁর স্বস্তি পাওয়ার কথা, কারণ ওদুদের ধর্ম ও সমাজভাবনামূলক প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হওয়ার মুখেই তাঁকে ঘিরে বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়। রামকৃষ্ণের ভক্তরা তাঁর 'যত মত তত পথ' কথাটিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের সূত্ররূপে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলে ওদুদ সে-সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন তাতে তাঁর যুক্তিচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যাবে :

> সব ধর্ম সত্য, এটি একটি শিথিল চিন্তা মাত্র। সর্ব ধর্মের ভিতরেই যথেষ্ট মিথ্যা বা অসার্থক ভাবনা রয়েছে মানুষকে সেসব কাটিয়ে উঠতে হবে, এই চিন্তারই সত্যকার মর্যাদা। ধর্মের অপর নাম মনুষ্যত্ব-সাধন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি এই মনুষ্যত্ব-সাধনের সহায় হয়, তবেই তা ধর্ম, নইলে তা আচার-অনুষ্ঠানমাত্র মাত্র। মনুষ্য-সাধন নতুন নতুন দাবি নিয়ে আসছে; তাই কি ধর্ম, তাঁর খোঁজ অতীতে যতটা নিতে হবে তার চাইতে অনেক বেশি নিতে হবে বর্তমানে, আর সচেতন থাকতে হবে বর্তমান ভবিষ্যতে যেভাবে রূপায়িত হচ্ছে সে-সম্বন্ধে। (ওদুদ, ১৯৯০ : ১০৬)

এই মন্তব্যকারীকে ব্যক্তি-পূজারী বলা কঠিন। এমন সাহসী ধারণায় ওদুদ পৌঁছন রামমোহনের প্রেরণায়—*তুহফাতুল মুয়াহহিদিন* (১৮০৪) নামক যুগ-আলোড়ক বইটিতে প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছিলেন রামমোহন। বইটি হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান—এই তিন ধর্মের ঝাণ্ডাধারীদের বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল; বইটিতে রামমোহন ধর্মের অলীক দিকগুলোকে খণ্ডন করে যে-পরমসত্তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাতে আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ব্রাহ্মণদের আঁতে ঘা লেগেছিল বেশি, এক শ্রেণি তো তাঁকে ব্রিটিশ/খ্রিষ্টান-তোষক বলতেও দ্বিধা করেননি। রামমোহনের বিশ্লেষণে মুসলিম ও খ্রিষ্টান-শাস্ত্রীদেরও অসন্তুষ্ট হওয়ার বেশ কারণ ছিল, কিন্তু এ-বিষয়টি এখনো ততটা আলোচিত হয়নি। যিশুখ্রিষ্টের নির্বাচিত বাণী নিয়ে বইটি যখন প্রকাশ করেন রামমোহন সেসময় খ্রিষ্টানরা তাঁর উপর বেজায় নাখোশ হন, আর ভারতবর্ষে শরিয়তের মোড়কে যে-ইসলাম তখন প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গেও রামমোহনের চিন্তার বিরোধ ছিল অনেক। ওদুদের জীবন পাঠ করলেও এমন ঘটনা মিলে যায়—১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে *তুহফাতুল মুয়াহহিদিন*-এ মুক্ত মতের পরিচয় দিয়ে রামমোহন যে-বিতর্কের শিকার হন, তার একশতাব্দীরও অধিক কাল পরে ওদুদ তাঁর সমাজ থেকে মুক্তবুদ্ধির প্রচার করতে গিয়ে একইভাবে আক্রান্ত হন।

রামমোহনের চরিত্র ও রচনায় মুক্তবুদ্ধি ও ভগবদ্‌ভক্তির যে-উপাদান আছে, তারই ধারা থেকে উৎসারিত আরও দু-জন ব্যক্তি এখানকার ভাবান্দোলনে অনেক অবদান রাখেন, তাঁদের একজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন কেশবচন্দ্র সেন। ওদুদ এঁদের চিন্তা নিয়ে আলাদাভাবে না লিখলেও *বাংলার জাগরণ*-এ যে-বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাতে বোঝা যায়, তাঁর মননবিশ্বে তাঁদের চিন্তার অনেক উপাদান যুক্ত হয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, রামমোহন ও তাঁর এই দুই ভাবশিষ্যের সীমাবদ্ধতা-বিষয়ে ওদুদ ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন ।

কাজী আবদুল ওদুদের আরেক আগ্রহের চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে বিতর্কের শেষ নেই। *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ও আরও কিছু প্রবন্ধ নিয়ে যে-বিতর্কের শুরু এবং তার শিল্পীসত্তা ও প্রচারকসত্তা নিয়ে যে অভিযোগ, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে তার প্রতি পক্ষপাত দেখানোর কথা কাজী আবদুল ওদুদেরই। কারণ, যে-মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেননি বলে বঙ্কিম অভিযুক্ত, তাঁদের জাগরণের চিন্তাই তো আজীবন করে গেছেন ওদুদ, কিন্তু তিনি সেরকম কোনো অভিযোগ করেননি, বরং এ-বিষয়ে তাঁর মত ছিল বিপরীত :

> যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা, অর্থাৎ মুসলমান-বিদ্বেষ, সে-অপরাধে তাঁকে সহজেই অপরাধী না ভাবা যায় এই বিবেচনা থেকে যে মীরকাশেম, দলনী বেগম, চাঁদশা-ফকির, ওসমান প্রভৃতি কয়েকটি সর্ববাদিসম্মতরূপে উৎকৃষ্ট মুসলমান চরিত্র তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, আর 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্যে' তিনি যাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন তারা জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ। (হক, ১৯৯৮ : ৩৮৯)

তবে ওদুদ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভার কাছে তাঁর 'স্বজন-বাৎসল্য' এবং তাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠার জন্যে তাঁর প্রতি খানিকটা অনুযোগ দেখিয়েছেন—তাঁর মতে, এমন সাহিত্যব্রতীর কাছে জাতি উঁচুস্তরের সাহিত্যই কামনা করে। আসলে এই স্তরের সাহিত্যপ্রতিভা সকলের থাকে না বলেই বঙ্কিমের কাছে ওদুদের উচ্চাশা ছিল বেশি। তাই বলে তাঁর স্বজাতিহিতৈষণাকে ছোটো করে দেখেননি ওদুদ, বরং স্থানে-স্থানে তাঁর পক্ষাবলম্বন করে তর্কও করেছেন প্রচুর। ওদুদের আপত্তি ছিল তাঁর আতিশয্যে, এর বাইরে বঙ্কিমের সঙ্গে স্বজাতির উন্নতি-কামনার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য ছিল অনেক; এর জন্যে তাঁর কাছ থেকে গ্রহণও করেছেন প্রচুর। বঙ্কিম *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৩) রচনা করে স্বসমাজের কাছ থেকে যতটা বিরাগভাজন হয়েছিলেন, ওদুদ মুহাম্মদকে (সাঃ) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি। আসলে উনিশ শতকের আধুনিকতার সদর্থক চেতনা গ্রহণ করেও বঙ্কিম ভারতবর্ষ ও হিন্দুসমাজকে যে-রূপে জাগাতে চাইছিলেন, ওদুদও কখনো প্রায় তাঁরই মতো করে, কখনো-বা নিজসমাজকে অন্যসমাজের আলোকিত অংশের সমরূপে দেখতে চেয়েছিলেন; তারপরও বাংলা সাহিত্যের এই দুই কল্যাণকামী মহৎ প্রতিভা বারবার ভুল মূল্যায়নের শিকার হয়েছিলেন। বঙ্কিম-সম্পর্কে ওদুদের অনুরাগের বিস্তর পরিচয় আমরা তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৩১), 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব' (১৯৩৯), 'বাংলার জাগরণ' প্রভৃতি লেখায় পেয়েছি, এরপরও তিনি বঙ্কিমের শিল্পীসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারকসত্তাকে মাথায় রেখে পাঠককে সতর্ক করে বলেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সার্থক চিন্তা আর অসার্থক চিন্তা যে এমন জট পাকিয়েছে সেই জটিল বন্ধ মোচন করতে না পারলে একালে তাঁর চিন্তা থেকে তেমন সুফল লাভের আশা নেই।...শিল্পী হিসেবে তাঁর গৌরব অবশ্য আজও অক্ষুণ্ন, কেননা সেখানে পরিচয় রয়েছে মানুষের সঙ্গে তার সহজ গভীর যোগের। আমাদের ধারণা হয়েছে, শিল্পীরূপেই বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, চিন্তানেতারূপে তাঁর ত্রুটি বড়ো রকমের।—তবে তার সেই ত্রুটি সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন থাকলে তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম থেকে কিছু সুফল লাভ হতে পারে। (ওদুদ, ১৯৮৮ : ৭৩)

আমাদের মনে হয় 'সুফল লাভ'-এর জন্যে বঙ্কিমপ্রতিভা সম্পর্কে 'প্রকৃত সমঝদারির' যে-প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন, সেই সমঝ তার ছিল বলেই বঙ্কিমপ্রতিভা থেকে সবধরনের সদর্থক গুণ নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উদারমানবিক চিন্তা, সাহিত্যবোধ, সমাজপ্রেম ইত্যাদির জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজী আবদুল ওদুদের ঋণ ছিল অশেষ; হয়তো এই কারণেই অনেকে তাঁকে রবীন্দ্র-শিষ্য বলে অভিহিত করা হয়। ওদুদের *রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ* (১৯২৭) বের হলে বইটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক সকলেই আকৃষ্ট হন —এই বই পড়ে ওদুদকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> আমার রচনা এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ করেছে বলে মনে পড়ে না। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম সহানুভূতি ও ভাষা-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মতো পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৮ : ২২৩)

শুধু রহস্য-উন্মোচক রচনা হলে আলাদা কথা, কিন্তু সরস বিচারপূর্ণ সমালোচনা যখন খোদ লেখকেরই সৌভাগ্যের কারণ হয় তখন ব্যাপারটি আগ্রহ-উদ্দীপক হওয়া স্বাভাবিক। বইটি পড়ে বিনয় সরকারের মতো জাঁদরেল পাঠক ও সমালোচক আলাপচারিতে বলেন : 'আবদুল ওদুদের রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ বেরিয়েছে একালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের পরে। ১৯২৭ সালে। বইটা আকারে বড় নয়, যা হ'ক বই। আলোচনা চিত্তাকর্ষক'। বিনয়, ২০০৩ : ৩৩২) রবীন্দ্রনাথের কবিতাই শুধু নয়, তাঁর অন্যান্য লেখাও যে গভীরভাবে পাঠ করেছেন তার পরিচয় রয়েছে ওদুদের বিভিন্ন লেখায়। ওদুদ রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন এটা সত্য, কিন্তু এই ভক্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহও কম ছিল না—নিজাম বক্তৃতার জন্যে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে ওদুদকে নির্বাচন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীলতাকে যে-সম্মাননাটুকু দেন, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। ওদুদও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সেই সম্মানটুকু রেখেছিলেন, তার প্রমাণ বিদ্বৎ-মহলে *হিন্দু মুসলমানের বিরোধ* (১৯৩৬) বইটির এত কদর, যেটি নিজাম বক্তৃতা হিসেবে রচিত তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।

মননচর্চা ছাড়াও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদুদের যে-চিন্তা, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা স্বীকার করে বলতে হয়, সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর কথাও মেনে নিতে পারেননি; ওদুদের প্রায়-অবিচল জীবনদর্শন যখনই যার কাছে তাঁর মনের উপযোগ খুঁজে পেয়েছে, গ্রহণ করেছে, নয়তো বর্জন করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি; গ্রহণ-বর্জনের বেলায় বিবর্তনশীল রবীন্দ্রচিন্তার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

জীবন ও কাব্য-আলোচনায় ছাব্বিশটি বছর ব্যয় করে ওদুদ গ্যেটের ওপর যে-বইটি লেখেন তা আজো অবিকল্প বলে স্বীকৃত; হয়তো এই নিবেদন ও গুরুত্বের কারণেই অন্নদাশঙ্কর ওদুদকে গ্যেটেপন্থি বলেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :

> গ্যেটের উপর দশখানা বই পড়ে একখানা বই লেখা আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু কবিগুরু গ্যাটে যারা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই একটি নতুন রস আস্বাদন করেছেন। সেটি একজন প্রাচ্য স্বকীয় উপলব্ধির জীবনরস। ও বই পণ্ডিতের সন্দর্ভ নয়। কাজী চলে গেছেন মরমে। তিনিও একজন মরমী সাধক। (সাঈদ, ২০০১ : ৭৩)

কবিগুরু গ্যেটে পড়ে সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিত লিখেছিলেন :

> তিনি যে আমাদের মাতৃভাষাকে একখানা অতি উপাদেয় বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক মহাগ্রন্থ উপহার দিয়া এই মাতৃভাষার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন সেই জন্য তাহাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়া আসিয়াছি। গ্যেটের সম্বন্ধে তিনি যে বড়ো বইখানি লিখিয়া গিয়াছেন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা হয় না। এই একখানি মাত্র বইয়ের মাধ্যমেই আমরা ওদুদ সাহেবের চিন্তা ও মননের প্রসার ও গভীরতার, তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর ও সর্বগ্রাহিতার এবং বিশ্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহার সর্বন্ধরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। (কাদির, ১৯৭৬ : ১-২)

গ্যেটের মহৎ প্রতিভার মধ্যে ওদুদ তাঁর চিরআকাঙ্ক্ষিত যে-বিশ্ব-আত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন তা সর্বত্র বিরাজ করে না বলেই তিনি বহুদিন গ্যেটে-চর্চা করে, জায়গায়-জায়গায় প্রভাবিতও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ওদুদকে সারাজীবন আকৃষ্ট করেছিলেন, গ্যেটে সে-রকম করেননি সত্য, কিন্তু ওদুদের দীর্ঘ গ্যেটে-অভিভূতি তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে ঋদ্ধ করেছিল।

গ্যেটে ছাড়াও ওদুদের সাহিত্যচিন্তা ও মননকে প্রভাবিত করেছিলেন আজন্ম শান্তিকামী সাহিত্যিক রোমা রোলাঁ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রোমা রোলাঁর বহুআলোচিত *জাঁ-ক্রিস্ত ফ*-এর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরপরই *লা ভী অ্যরজ* পত্রিকার পুরস্কার পায় এবং এর সাতবছর পর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বাকি সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাতিন আমেরিকা, স্পেন, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোয় তার অনুবাদ হয়, আর অচিরেই সেটি ফরাসি সীমানা পেরিয়ে ইউরোপীয় জীবনোপন্যাসে পরিণত হয়। বিশেষত পঞ্চম খণ্ডের যুদ্ধবিরোধীর চেতনা বিতর্কের ঝড় তোলে আর ফরাসি জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে দেশশত্রু ভাবতে শুরু করে; অথচ রোমা রোলাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি শুধু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেই সেই চেতনা সঞ্চারিত করে বসে থাকলেন না, ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের উন্মত্ততা বন্ধের চেষ্টা করতে লাগলেন; বেলজিয়ামের লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন আক্রমণ করে বসল জার্মানি তখন তিনি ভাবলেন লুভ্যাঁ ধ্বংস হওয়ার অর্থ তো ইউরোপীয় সংস্কৃতির তীর্থভূমি ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের নোবেলজয়ী জার্মানির সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখক গেরহার্ট হাউপ্টম্যানকে চিঠি লিখলেন রোমা রোলাঁ :

> যে সব ফরাসী জার্মানিকে বর্বর বলে মনে করে আমি তাদের দলের কেউ নই, হাউপ্টম্যান...কিন্তু 'আপনারা আজ কী হয়ে গেছেন? আজ কী নামে আপনাদের ডাকব...? 'আপনারা গ্যয়টে, না আটিলার বংশধর?' উত্তরে হাউপটম্যান লিখলেন : 'আমরা বর্বর জার্মানি হয়েই থাকতে চাই।' (অবন্তীকুমার, ১৯৮৪ : ২৫)

শান্তির জন্যে রোমা রোলাঁর এরকম নিঃস্বার্থ চেষ্টা, অন্ধ জাতীয়তাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা ওদুদকে তাড়িত করেছিল; ওদুদ তাঁর লেখকজীবনের প্রথম পর্যায়ে জাঁ-ক্রিস্তফের আদলে *আজাদ* নাম দিয়ে চার খণ্ডে একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং *খেলাধুলা* (১৯৪৮) নাম নিয়ে তার প্রথম কিস্তি ছাপিয়েওছিলেন আবদুল কাদির সম্পাদিত *জয়তী* পত্রিকায়, কিন্তু সেই উপন্যাস-পরিকল্পনার আশানুরূপ বাস্তবায়ন ঘটেনি। তবে ওদুদ ভারত-ভাগের বিরোধিতা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা—যা ওই উপন্যাসেরও অন্যতম মর্মবস্তু—আজীবন করে গেছেন।

এই উপন্যাসের সূত্রেই কাজী আবদুল ওদুদের মননে গান্ধীর প্রভাব-বিষয়ে আলোচনা করা যায়। কারণ, ওদুদের উপন্যাসটির বিষয় ছিল অসহযোগ আন্দোলন, আর এই আন্দোলনের জনয়িতা ছিলেন মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী। এ-প্রসঙ্গে বলা যায় :

> রাষ্ট্রচিন্তায় যাঁর আদর্শের প্রতি তিনি আজীবন সমর্থন জ্ঞাপন করে গেছেন তিনি গান্ধীজী। ১৯২১ সালে প্রকাশিত 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'জয়তু মহাত্মা' শীর্ষক নিবন্ধ অবধি বিভিন্ন রচনায় তার পরিচয় আছে। এই দীর্ঘ কালবৃত্তে নিয়ত-পরিবর্তমান রাজনীতিতে গান্ধী-আদর্শের তিনটি মূলনীতির প্রতি তার সমর্থন অপরিবর্তিত ছিল : সত্যাগ্রহ, অহিংসা ও চরকা। (হক, ২০০১ : ১৪০)

তবু, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে যেহেতু ওদুদের ছিল নিজস্ব চিন্তা, সেহেতু গান্ধীর সকল মত তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগে কংগ্রেস-লীগের বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন গান্ধী শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কেই অহিংস নীতি অনুশীলনে ডাক দিয়েছিলেন, কারণ, অহিংসা যে হিন্দুচিন্তার মর্মকথা—এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেও, তা মুসলিমচিন্তারও মর্মকথা কি-না সে-ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলেন। ওদুদ গান্ধীর এ-চিন্তার সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে বলেন যে, যারা আজো অস্পৃশ্যতা-বিষে জর্জরিত তারা তাদের জীবনে প্রকৃত অর্থে অহিংসা নীতি বরণ করেছে, এমন ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। ওদুদের মত—হিন্দুচিন্তা ও মুসলিমচিন্তা, এই দুই ধারার মর্মকথা যদি অহিংসা নাও হয়, তবু অনুশীলনে সব সম্প্রদায়কে আহ্বান করলে পরিবেষ্টনের প্রতি সত্যাশ্রয়িতার পরিচয় দেওয়া হত; কিন্তু গান্ধী তা করলেন না। অথচ ওদুদ মনে করতেন, অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার জন্যে গান্ধীর অহিংসা অর্থাৎ পরস্পর সহনশীলতার পথ একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীর উক্ত আহ্বান কার্যত সাম্প্রদায়িকতার অনুকূলে চলে গেলেও তাঁর আন্তরিক অহিংসা নীতি ওদুদ আজীবন তাঁর হৃদয়ে লালন করে গেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর জীবনের শেষপর্যায়ে এসে *হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম* (১৯৬৪) নামক যে-বইটি রচনা করেন, তার পরিকল্পনা ও শুরু যে তাঁর লেখকজীবনের প্রথম দিকে হয়েছিল এই তথ্য বইটির ভূমিকাতেই আছে। ওদুদ তাঁর শেষজীবনে কুরআনের একটি তরজমাও করেছিলেন। বার্ধক্যে এসে এই কষ্টসাধ্য কাজ এইজন্যেই করেছিলেন যে, তিনি সবকিছুর পূর্ণরূপ সন্ধানের চেষ্টা করতেন, কোনো কিছুর আংশিক সমঝদারিতে তাঁর আস্থা ছিল না। ওদুদ তাঁর অন্যান্য লেখায় যেমন মানুষ মুহাম্মদের (সাঃ) গুণাবলিকে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন, এই গ্রন্থেও তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। বইটির ভূমিকায় রচনার প্রধানতম যে-উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন তা ওদুদের আধুনিক মনের পরিচয় তুলে ধরে। তিনি লিখেছেন :

> এই বইতে নতুনকে পাওয়া যাবে, রূঢ়-আঘাত-অনিচ্ছু, বিচারবান, প্রেমপরায়ণরূপেই।...বলা বাহুল্য নতুন চিন্তা-ভাবনার দাবি যদি স্বীকার না করতাম তবে নতুনকালে এই বই লেখা অর্থহীন হতো। (ওদুদ, ১৯৮৮ : ৫)

ওদুদ তাঁর জীবনে অন্যান্য মহৎ ব্যক্তির গুণাবলি দ্বারা যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন মুহাম্মদের (সঃ) দ্বারাও সেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বুদ্ধির মুক্তিকামীরা কবি শেখ সাদী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এই তথ্যটি দিয়েছিলেন ওদুদ; তিনি তো সেই দলেরই একজন সভ্য, কিন্তু তাঁর একাধিক লেখায় সাদীর কয়েকটি উক্তি আলোচিত হলেও তাঁকে নিয়ে লেখা কোনো রচনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এছাড়া ওদুদ বেশ গুরুত্বের সঙ্গে সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানি ও মুস্তফা কামাল সম্পর্কে লিখেছেন—এই দুই ব্যক্তির চিন্তা ও উদ্যম থেকে তিনি যে-প্রাণনাটুকু গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল ভেতর-বাহির উভয়েরই প্রাণনা। ওদুদ তাঁর নিজের জীবন্মৃত সমাজে চেতনা জাগানোর ব্রতটুকু নিয়ে নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, একই ব্যাপার আমরা দেখি আফগানির বেলায়ও। প্যান-ইসলামিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা আফগানের অধিবাসী জামালুদ্দিন যেখানেই গেছেন সেখানকার ভাবজগতে ঝড় তুলেছেন; তিনি ঘুমন্ত মুসলমান-সমাজকে জাগানোর সঙ্গে-সঙ্গে ভোগবিলাসী মুসলিম সুলতানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বিভিন্ন সময়ে গড়ে-ওঠা কুসংস্কারের ধ্বংস-কামনাকারী আফগানি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন। ওদুদ নিজে আফগানির কোনো কোনো চিন্তার সমর্থক হলেও পৃথক রাষ্ট্রগঠনের ইচ্ছাটিকে একদমই মেনে নিতে পারেননি, কেননা তিনি মনে করতেন, এমন চিন্তা মুসলমানদের দুর্বলতারই পরিচায়ক।

ওইদিকে মুস্তফা কামাল তুরস্কে যে-পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, তা ওই দেশের জন্যে তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের জন্যও ছিল অভাবনীয়—অনেকের কাছে এই উদ্যম ও নতুন চিন্তার উদ্বোধনকে অনৈস্লামিক মনে হলেও ওদুদ একে বিচিত্রমুখ ইসলামের অন্য একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করে একে স্বাগত জানানোর জন্যে মুসলিম সমাজকে প্রণোদিত করতে চাইলেন। ওদুদ লিখলেন :

> মুসলমান-ইতিহাসের স্তরে স্তরে এইভাবে একঢালা বৈচিত্র্যহীনতাই যে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না, তা মুসলমানের মন্দ ভাগ্যের জন্যে নয়, শক্তিহীনতার জন্যেও নয়, এই বৈচিত্র্যবিপুলতাই মানব-প্রকৃতির জন্য সত্য। (ওদুদ, ১৯৮৩ : ৩৬৯)

এই দুই ব্যক্তি ছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদের মননে সৈয়দ আমির আলী, মুহাম্মদ ইকবাল এবং মুসলিম দর্শনের মুতাজেলা মতবাদের আংশিক প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। আসলে ওদুদ মননচর্চার ক্ষেত্রে সবসময়ই ছিলেন গ্রহিষ্ণু—এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কাজ করেছিল লোকশ্রেয়জাত ধারণা আর অবশ্যই সুগভীর কাণ্ডজ্ঞান। নানা ধর্ম-মত-আদর্শজাত মানুষের সদ্‌গুণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরেও আপন মত প্রকাশের বেলায় তাঁর অবিচলিততর ভাব, নিজের কাছে যেরকমই মনে হোক, অপর পাঠকের কাছে সবসময় অজটিল মনে হয়নি—এই জটিলতা তাঁর মনের গড়ন আর বিচিত্রমুখ মননের জটিলতা। ইতিহাস আর ভূগোলের দ্বন্দ্বে পীড়িত/বিড়ম্বিত অনেক বাঙালি মুসলিম চিন্তক যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ছিলেন কাতর ও অবিচল, ওদুদ সেখানে—নিজ সম্প্রদায়ের হিতকামী হওয়া সত্ত্বেও—শিক্ষিত হিন্দু সমাজের শতাধিক বৎসরের চিন্তা ও কর্মের বিশ্বধারাকে গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন; কারণ 'তাকে অগ্রাহ্য করে মুসলমানের জীবনে সার্থক নবজাগরণ আসতে পারে—একথা তিনি মনে করতেন না।' (সাঈদ, ২০০১ : ১২৯) আসলে বঙ্কিমপ্রতিভার জটিলতা বিষয়ে একসময় যা ভেবেছিলেন ওদুদ, তার পাঠককেও মাঝে-মধ্যে সেরকম ভাবনার মধ্যে পড়তে হয়; কিন্তু বঙ্কিমকে মূল্যায়নের জন্যে তাঁর ঐতিহাসিক যে-দিকটির কথা ভুলে-থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ওদুদ, তাঁর ক্ষেত্রেও তাঁর রচনায় বর্ণিত ইতিহাসপুরুষ ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা ভুলে গেলে মননবিশ্বের জট মোচনও যে-কোনো সমঝদারের পক্ষে কঠিন হতে বাধ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

অবন্তীকুমার সান্যাল (১৯৮৪)। *প্রসঙ্গ : রোমা রোলাঁ*। প্যাপিরাস, কলকাতা।

আবদুল কাদির (১৯৭৬)। *কাজী আবদুল ওদুদ* (পরিশিষ্ট-এ সংযোজিত অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত 'কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গে')। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল হক (২০০১)। *বাঙালীর জাগরণ*। [সম্পা.] আহমাদ মাযহার। অনুপম, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৮৮)। *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* প্রথম খণ্ড। [সম্পা.] আবদুল হক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৯০)। *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড। [সম্পা.] আবদুল হক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ (১১৯৪)। *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* ষষ্ঠ খণ্ড। [সম্পা.] খোন্দকার সিরাজুল হক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৯৯)। *কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী*। [সম্পা.] আবুল আহসান চৌধুরী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৮৩)। *শাশ্বত বঙ্গ* । ব্রাক, ঢাকা।

বিনয় সরকার (২০০৩) : *বিনয় সরকারের বৈঠকে*। দে'জ, কলকাতা।

সাঈদ-উর-রহমান [সম্পা.] (২০০১)। *ওদুদ-চর্চা* । কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০২) : *প্রবন্ধসমগ্র* ১ম খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০০৮)। *প্রবন্ধসংগ্রহ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।